গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ - ৪ জানুয়ারি ২০১৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

টু-জি কেলেঙ্কারি

‘খাঁচার তোতা’ জানাল সবই নাকি মায়া

কোথাও কোনও দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ সরকারি কোষাগারের ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা উধাও! দেশের কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষের বহু কষ্টার্জিত টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি তহবিলের অংশ ছিল তা। এই টাকা গায়েব, অথচ ৭ বছর তদন্তের পর মোটা বেতন-সুযোগ-সুবিধাধারী সিবিআইয়ের তাবড় অফিসাররা কোর্টে কিছুই প্রমাণ করতে পারলেন না! নাকি চাইলেন না!

বোফর্স কেলেঙ্কারি, দিল্লির শিখ নিধন যজ্ঞ, কর্ণাটকের খনি কেলেঙ্কারি, অক্ষরধাম মন্দিরে হামলা, বাবরি মসজিদ ধ্বংস ইত্যাদি অসংখ্য মামলায় সিবিআইয়ের ‘ব্যর্থতার’ তালিকা বেড়েই চলেছে। গুজরাটে ২০০২ সালের সংখ্যালঘু গণহত্যার নায়ক বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের বাঁচাতে সিবিআইয়ের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন সারদা মামলায় সিবিআইয়ের লম্ফ ঝম্পের পর ফলাফল শূন্য। ছোট আঙারিয়া, নন্দীগ্রাম, নেতাইয়ের গণহত্যাকারীদের শাস্তি দূরে থাক, সিবিআই তদন্ত কাউকে ধরতেই পারেনি। সিঙ্গুর আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনাতেও খুনি ধরতে সিবিআই ব্যর্থ। এ নিছক ব্যর্থতা বা অপদার্থতা নয়, এ হল পরিকল্পিত ব্যর্থতা। কেন্দ্রে বা রাজ্যের মসনদে যে দলগুলি নানা সময় ক্ষমতায় থেকেছে বা এখন বিরোধী আসনে থাকলেও পরে গদিতে বসতে পারে, তাদের কেষ্ট-বিষ্টুদের অপকর্মের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিবিআইয়ের মাথাব্যথা কোনওদিনও ছিল না, আজও নেই। টু-জি স্পেকট্রাম মামলাতেও বিচারক বলেছেন, সিবিআই প্রথমে খুব তেড়েফুঁড়ে মামলা লড়ছিল তারপর যত দিন গেছে তত যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে তারা। তাদের দিশাহীন অবস্থা এবং অতিসাবধানী হয়ে সব দিক বাঁচিয়ে চলার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল কী খুঁজতে হবে আর কী প্রমাণ করতে হবে সেটাই যেন সিবিআই জানে না! সিবিআইয়ের হয়ে মামলা লড়ছিলেন যাঁরা সেই স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর এবং সিবিআইয়ের নিয়মিত আইনজীবী দু’জনে দুই দিকে চলছিলেন। কিন্তু কেন? তাঁরা তো নাবালক বা নিছক এফিডেভিট করার উকিল নন! মনে রাখা ভাল, ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে বলেছিল ‘খাঁচায় পোষা তোতা’, অর্থাৎ সে শুধু মনিবের শেখানো কথা আউড়ে যায়। সিবিআই-এর প্রাক্তন অধিকর্তা রণজিৎ সিনহাকে টু-জি মামলা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টই। ফলে তদন্তের মান কী দাঁড়াতে পারে তা অনুমান করার জন্য বিরাট পণ্ডিত হতে হয় না।

এই মামলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেখা যাক। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ল্যান্ডলাইন ও মোবাইল পরিষেবার লাইসেন্স বণ্টন করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের টেলিকম দফতর দরপত্র আহ্বান করে। শেষ তারিখ ছিল ১০ অক্টোবর। কিন্তু ২০০৮ সালের ১০ জানুয়ারি হঠাৎ করে তারা জানায় যারা ১ অক্টোবরের মধ্যে দরপত্র দিয়েছিল শুধু তাদেরই যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ফলে জমা পড়া ৫৭৫টি আবেদনের ৪০৮টিই বাতিল হয়ে যায়। অভিযোগ ওঠে সাত বছর আগেকার দর রেখে এবং সময় পাল্টে কিছু বিশেষ সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন সিবিআইকে এ বিষয়ে তদন্ত করতে বলে। দিল্লি হাইকোর্টও বলে অনিয়ম হয়েছে। ওই বছরই ২০ নভেম্বর কর্পোরেট জনসংযোগ সংস্থা বৈষ্ণবী কমিউনিকেশনস-এর আধিকারিক নীরা রাডিয়ার সঙ্গে টাটাদের কথোপকথনের একটি অডিও টেপ কেন্দ্রীয় আয়কর

দুয়ের পাতায় দেখুন

ঝাড়খণ্ডে কলেজ নির্বাচনে এআইডিএসও-র বিরাট জয়। সংবাদ আটের পাতায়

পাশ-ফেল ঃ অবশেষে ‘আর এস এস-জুজু’ দেখাচ্ছে সিপিএম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু ২৪ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, “সিপিএম, সিপিআই সহ বামফ্রন্টের শিক্ষক সংগঠনগুলো যেভাবে এক সুরে প্রতারণামূলক বক্তব্যে স্কুলছুটের অজুহাত তুলে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর বিরোধিতা করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। এ রাজ্যের জনসাধারণ ভুলে যাননি যে, সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় বসেই প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছিল। তখন তারা স্কুলছুটের একই ‘তত্ত্ব’ দিয়েছিল। অথচ তাদেরই মাননীয় মন্ত্রী অশোক মিত্রের নেতৃত্বে তাদের সরকার নিয়োজিত কমিশন বলেছিল, “এর (পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার) ফলে প্রাথমিকে শিশুদের যতটুকু শেখা উচিত ছিল তা হচ্ছে না। স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে।” তবু সিপিএম সরকার তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাশ-ফেল চালুর দাবিতে দিল্লিতে ছাত্রবিক্ষোভ

২১ ডিসেম্বর দিল্লিতে ছাত্র সমাবেশ। সংবাদ চারের পাতায়

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভ

কয়লার দাম ৪০ শতাংশ এবং জিএসটি-তে ৭ শতাংশ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ১.৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩.৫০ টাকা করেছে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার। এর প্রতিবাদে ২০ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি যৌথভাবে রাজ্যের জেলায় জেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপরের ছবি জৌনপুরের। অন্যান্য জেলার আরও ছবি পাঁচের পাতায়।

‘গুজরাট মডেল’ কী জিনিস টের পেয়েছেন চাষিরা

গুজরাট নির্বাচন

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। ৯৯টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কিন্তু সত্যিই কি জয় হয়েছে বিজেপির? এ তো কোনও ক্রমে মুখরক্ষা। ২০১২ সালের নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ১১৭টি আসন। দলের সভাপতি অমিত শাহ এবার ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা ১৫০টি আসন পাচ্ছেনই। সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এমনকী নিজেদের আসনগুলিও তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। ১৮টি আসন খুইয়েছেন, ৩১টিতে জয় এসেছে নামমাত্র ব্যবধানে।

অথচ গুজরাটে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুজরাটে ৬৪টি নির্বাচনী সভা করেছেন। প্রচারে নামিয়েছিলেন গোটা মন্ত্রীসভাকে। নেমেছিলেন দলের আট জন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে দেশের মানুষ বুঝতেই পারছিলেন না, নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী না গুজরাটের। প্রচারে নেমে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের মর্যাদারও কোনও তোয়াক্কা করেননি। এর আগে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ‘গুজরাট মডেলের’ যে চোখধাঁধানো প্রচার মানুষ দেখেছিল এবারের প্রচারে কোথাও তার দেখা মেলেনি। দেখা মেলেনি ‘বিকাশ পুরুষের’। ‘বৃহত্তম গণতন্ত্রে’র নির্বাচনী বিধিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে, নির্বাচন কমিশনকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তথা হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণের রাজনীতিই এবার প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতাদের প্রচারের মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল।

‘বিকাশ পুরুষ’ হিসাবে এতদিনের তুলে ধরা মোদি এমন করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড সনৎ দত্তের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণতম সদস্য এবং শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সভাপতি এবং সর্বভারতীয় কমিটির প্রাক্তন সহ সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড সনৎ দত্ত দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদি এবং শ্রমিকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এআইইউটিইউসি এবং এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য দপ্তরে এবং বিভিন্ন পার্টি অফিসগুলিতে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ও কমরেডরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা কমরেড শঙ্কর সাহা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। তাঁরা কমরেড সনৎ দত্তের মরদেহে মাল্যদান করেন। মাল্যদান করেন দলের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। এরপর তাঁর মরদেহ কলকাতার 'পিস ওয়ার্ল্ড'-এ রাখা হয়। ২৪ ডিসেম্বর সকালে তাঁর মরদেহ দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর ৪৮ লেনিন সরণিতে এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হলে কমরেড সনৎ দত্তের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা ও বিপ্লবী অভিবাদন জ্ঞাপন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড শঙ্কর সাহা, কমরেড গোপাল কুণ্ডু, কমরেড ছায়া মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন দলের অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ, গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এরপর তাঁর মরদেহ উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়ায় দলের কার্যালয়ে পৌঁছলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রয়াত কমরেড সনৎ দত্ত বর্ধমানে কলেজ ছাত্র অবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দের মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি বিএসসি-তে গোল্ড মেডেলও পেয়েছিলেন। কিন্তু সচ্ছল জীবনের আরাম আয়েস এবং কেরিয়ারের হাতছানিকে উপেক্ষা করে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তা এবং শিক্ষার আধারে 'দলই জীবন' এই আদর্শকে পাথেয় করে এ দেশের মাটিতে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৮ সালে জয়নগরে দলের প্রথম প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে কমরেড সনৎ দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বর্ধমানের রায়না বিধানসভা কেন্দ্রে দলের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এরপর তিনি দলের নির্দেশে চলে আসেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আগরপাড়া কামারহাটি অঞ্চলে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে থেকে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে। ১৯৫৫ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের পথনির্দেশে গঠিত হয় 'বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। এই সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকেই কমরেড সনৎ দত্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘকাল পালন করেছেন। একই সাথে দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। হাতে গোনা ৩-৪ জন কমরেডকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জেলায় দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জেলায় দল এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের কাছে কমরেড সনৎ দত্ত ছিলেন পিতৃতুল্য নেতা। স্নেহ-ভালবাসা এবং আদর্শবোধ দিয়ে দলের কর্মীদের এবং সাধারণ শ্রমিকদের তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন। নিজেও অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। শুরুর দিকে টিউশন পড়িয়ে অতিকষ্টে হলেও হাসিমুখে জীবন নির্বাহ করেছেন। শ্রমিক শ্রেণি বিশেষ করে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে পড়ে

কেন্দ্রীয় অফিসে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

থেকে তিনি সংগঠন গড়েছেন। আগরপাড়া জুটমিল, কামারহাটি জুটমিল, প্রবর্তক জুটমিল এবং হিমানী কোম্পানি সহ বিভিন্ন কারখানায় কমরেড সনৎ দত্ত ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। গঙ্গা নদীর দু'পারে উত্তর ২৪ পরগণা ও হুগলি জেলায় তিনি চটকলের গেটে গেটে যেতেন, শ্রমিকদের নিয়ে ক্লাস করতেন। তাঁর সময়ানুবর্তিতা, আদর্শগত চর্চা, সহজ সরল ভাষায় সমস্যাকে বোঝাতে পারার ক্ষমতায় শ্রমিকদের ক্লাসগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড দত্ত চটকল শ্রমিক আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চটকল শ্রমিকদের সমস্যাগুলিকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝেছেন। অন্যান্য সরকারি কমিটিতেও তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার, প্রচারবিমুখ, সবসময় চাইতেন নতুনদের দায়িত্ব দিতে এবং এগিয়ে দিতে। যতদিন শারীরিক দিক থেকে সমর্থ ছিলেন ততদিন তিনি দল এবং শ্রমিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জীবনের শেষের সাত-আট বছর তিনি নানা রোগজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে গৃহবন্দি হয়ে পড়েন।

কমরেড সনৎ দত্তের মৃত্যুতে দল হারাল একজন বিপ্লবী নেতাকে, শ্রমিক আন্দোলন হারাল এক বলিষ্ঠ নেতাকে।

কমরেড সনৎ দত্ত লাল সেলাম

টু-জি কেলেঙ্কারি

একের পাতার পর

দফতর থেকে প্রকাশ হয়ে গেলে জানা যায় টাটা, রিলায়েন্সের মতো একচেটিয়া গোষ্ঠী কীভাবে সরকারি নীতিতে প্রভাব খাটিয়েছে। ২০১০ সালের ৩১ মার্চ সর্বোচ্চ সরকারি হিসাব পরীক্ষক কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) জানান, এই প্রক্রিয়ার পুরোটাই ছিল অস্বচ্ছ এবং পক্ষপাতদুষ্ট। ১৩ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে ৭০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে তিনটি মামলা দায়ের হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় টেলিকম ও যোগাযোগ মন্ত্রী এ রাজার কৈফিয়ত তলব করে সর্বোচ্চ আদালত। কয়েকদিন বাদে সুপ্রিম কোর্টকে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট) জানায় বিদেশি মুদ্রা আইনও ভাঙা হয়েছে। ১০ নভেম্বর ২০১০ সিএজি বলে গোটা প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা, নিলাম না করে ইচ্ছামতো স্পেকট্রাম বিলি ইত্যাদি কারণে রাজকোষের ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট স্পেকট্রাম প্রাপক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেয়। অভিযোগ ওঠে এ রাজার দল ডিএমকে প্রধান করুণানিধির কন্যা কানিমোঝির টিভি চ্যানেলে এই ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ঘুষের ২০০ কোটি টাকা ঢালা হয়েছে। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করে। ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টই অনিয়মের অভিযোগে ১২২টি টেলিকম সংস্থার লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। প্রশ্ন ওঠে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের ভূমিকা নিয়েও। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বলেন, শরিকদের নিয়ে চলতে গেলে অনেক আপস করতে হয়। অর্থাৎ তিনিও দুর্নীতি অস্বীকার করেননি। শুধু কংগ্রেসের বদলে ডিএমকে-র মতো শরিকরা দায়ী বলেছিলেন। এই মামলায় ডিএমকে নেতা এ রাজা, কানিমোঝি যেমন গ্রেফতার হয়েছিলেন, তেমনই একাধিক উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার সহ এসার গোষ্ঠীর অংশুমান ও রবি রুইয়া, লুপ টেলিকম সংস্থার কিরণ খৈতান, আই পি খৈতান প্রমুখ কর্পোরেট জগতের কর্ণধার যাঁরা ভোডাফোন, ডোকোমো, ইউনিনর ইত্যাদি নানা বৃহৎ কোম্পানির সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছিলেন, তাঁরাও অভিযুক্ত হন।

সিবিআই বিশেষ আদালতের এবারের রায় দেখে কংগ্রেসের নেতারা উল্লসিত যে, তাদের জমানার একটি দুর্নীতির অভিযোগ অন্তত কমল। কিন্তু বিষয়টি আদৌ কি তাই? লাইসেন্স বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি জিএস সিংভি এবং অশোককুমার গাঙ্গুলির ডিভিশন বেঞ্চ সে সময় স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল এই লেনদেন জনস্বার্থবিরোধী, সমতা রক্ষার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। যৌথ সংসদীয় কমিটিও দুর্নীতির কথা বলেছিল। কিন্তু সিবিআই আদালতের বিচারকের মন্তব্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে এই দুর্নীতির ঝাঁপি উদঘাটিত হোক তা সিবিআই চায়নি। কিন্তু কেন? প্রথমত, এই মামলায় কর্পোরেট জগতের একাধিক ব্যক্তির নাম জড়ানোয় শিল্পপতি মহল বিনিয়োগ গেল গেল বলে রব তুলে দেয়। ফলে তাদের খুশি করার দায় ছিল সরকারের উপর। পুঁজিবাদের প্রবক্তারা মুখে বলে অবাধ প্রতিযোগিতা। কিন্তু শিল্প গড়বে, আইন মেনে ব্যবসা করে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুনাফা ঘরে তুলবে, পুঁজিবাদের সে যুগ চলে গেছে বহুকাল আগে। এখন ফাটকার কারবার আর উচ্চপদস্থ আমলা-নেতা-মন্ত্রীদের প্রভাবিত করে, ঘুষ দিয়ে মুনাফা কামানো ছাড়া পুঁজিপতিদের আর কোনও উপায় নেই। এর নাম ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। এখন একজন পুঁজিপতি আলাদা করে অসৎ হয় না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। বিজেপি কংগ্রেসের মতো বুর্জোয়া দলগুলি এদের নায়েব-গোমস্তার মতো কাজ করে বলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এদের কারও পক্ষে প্রকৃত অর্থে সম্ভব নয়। বিজেপি জমানায় আম্বানি-আদানিরা যে বেপরোয়া কার্যকলাপ চালাচ্ছে, কংগ্রেস ফিরে এলে কি তার বিচার করতে পারবে? একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি জমানার বিচার সিপিএম করেনি, সিপিএম জমানার কোনও দুর্নীতির বিচার তৃণমূল করতে পারেনি। এই মামলাতেও সিবিআইয়ের কোনও অফিসারের সাধ্যই ছিল না প্রকৃত পদক্ষেপ করার। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এখন কেন্দ্রীয় সরকারি মসনদে না থাকলেও বিজেপির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ দেখে কর্পোরেট মহল এখন ডুবন্ত কংগ্রেসকে আবার ভাসিয়ে তুলতে চাইছে। এটাই ওদের দ্বিদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতি সংবাদমাধ্যমের সমর্থন এ কারণেই। ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশে পুলিশি তদন্ত থেকে বিচারব্যবস্থা কোনও কিছুই যে একচেটিয়া মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। ফলে কংগ্রেসের মুখ বাঁচানোটাও পুঁজিপতিদের দরকার, যাতে দরকারে আবার তাকে গদিতে বসিয়ে সেবা নেওয়া যায়। তৃতীয়ত, মাত্র কিছুদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডিএমকে প্রধান করুণানিধির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নিবাসে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন। তারপরেই করুণানিধি কন্যা কানিমোঝি ও তাঁর দলের নেতা এ রাজার ছাড়া পেয়ে যাওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে দীর্ঘ দিন ধরেই এটা প্রায় প্রথায় দাঁড়িয়েছে যে, ক্ষমতাসীন দল অন্যান্য দলের দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে তাদের ব্ল্যাকমেল করে। সিবিআইকে কাজে লাগিয়ে কখনও গ্রেপ্তার করে, কখনও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ছাড়িয়ে আনে। বিজেপি এই খেলাতে যথেষ্ট দক্ষ। কংগ্রেসও ঠিক এই কাজ করত জয়ললিতা কিংবা মায়াবতীর দলকে ধরে রাখতে। ডিএমকের সাথে কংগ্রেসের দূরত্ব বাড়াতে বিজেপি সিবিআইকে এই রকম অথর্বের ভূমিকায় অভিনয় করালো কি না সে সন্দেহও উঠছে।

বোফর্স, টু-জি, বাংলায় সারদা, নারদ, মধ্যপ্রদেশে ব্যপম কেলেঙ্কারি — কোথাও সিবিআই বা ইডি কোনও সংস্থাই দুর্নীতিগ্রস্তদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। একদিকে যেমন নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে অভিযোগগুলি জিইয়ে রাখার তাগিদ থাকে শাসকদলের পক্ষ থেকে, একই সাথে এই প্রতিটি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রীরা যাদের এজেন্ট হিসাবে দুর্নীতি করে সেইসব প্রভাবশালী পুঁজিমালিকদের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কোনও আমলা বা বিচারকের নেই। ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির কাছে দুর্নীতির ইস্যু কেবলমাত্র ভোটের প্রচারের একটি হাতিয়ার মাত্র। এই দলগুলি যে যখন ক্ষমতায় থাকে, দুর্নীতি করে। তাই এরা সকলেই একে অপরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটায়, কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্তদের নিয়েই চলে। শুধু কে বেশি, কে কম তাই নিয়ে চলে টানাটানি। সিবিআইয়ের ভূমিকা যে ধাঁধার জন্ম দিয়েছে অর্থাৎ টাকা গায়েব, কিন্তু কেউ তা চুরি করেনি— এ ধাঁধার উত্তর রয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থারই দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্রে।

প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতেই শিক্ষকদের আচরণবিধি

সম্প্রতি কলকাতা গেজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের প্রধান সচিব দুষ্মন্ত নারিয়েলের দ্বারা প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষামহল আলোড়িত। আলোচনা মূলত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।

এই গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-৯৮৪-এস ই/এস/১-এ-১০-২০১৭-এর চার নম্বর ধারায় ‘কোড অফ কন্ডাক্ট অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অফ টিচার অর নন টিচিং স্টাফ অফ দ্য রেকগনাইজড ইনস্টিটিউশন’ ২৪টি উপধারায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সতর্ক করা ও এই বিধি লঙ্ঘনে ৫ নং ধারায় শৃঙ্খলাজনিত কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলা আছে। শিক্ষামহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে আমাদের রাজ্য সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও পোষিত বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরির শর্তাবলি তো ইতিমধ্যেই ছিল, তা হলে কী কারণে সরকারকে নতুন করে আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হচ্ছে?

আমাদের দেশের শিক্ষার অগ্রগতি ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কখনওই যথাযথ ছিল না। প্রাক স্বাধীনতা যুগে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গরজ ছিল না বলেই সে যুগে শিক্ষাপ্রেমী মানুষদের যথেষ্ট সরব হতে হয়েছিল। সে যুগেই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল ‘দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ’। লালা লাজপত রাই একই সুরে বলেছিলেন ‘শিক্ষাই জাতির প্রথম প্রয়োজন এবং রাজস্বের সিংহভাগই এই খাতে ব্যয় হওয়া উচিত’। কিন্তু দেখা গেল স্বাধীনতার পর শাসকরা পরাধীন দেশের ব্রিটিশ শাসকদের ভাবনার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। যার পরিণামে একদিকে স্বাধীনতার পর থেকেই কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষার বাজেটে অবহেলার মনোভাব প্রকাশ করেছে এবং রাষ্ট্র দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে অভিভাবককুলের উপর আর্থিক দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে কমিশনের পর কমিশন বসেছে, একের পর এক নির্দেশাত্মক নীতি এসেছে, প্রাথমিক শিক্ষা যা একটি দেশের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে, মেধা ও উৎকর্ষ যা প্রাথমিক স্তর থেকেই ক্রমবিকাশের পথে নিয়ে যেতে হয় তা পঙ্গু করে শিক্ষার ভিত দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দেওয়ার যজ্ঞ ক্রমশ বেড়েছে। ১৯৫০ সালে সংবিধানের নির্দেশাত্মক ধারায় ১০ বছরের মধ্যে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেশজুড়ে সম্পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মৌলিক অধিকার হিসাবে শিক্ষাকে রাখার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দশ নয়, তেরো বছর পর এই ব্যর্থতা ঢাকতে ১৯৬৪-১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশনের মারফৎ গত দশকের শিক্ষার অগ্রগতি বিশ্লেষণে আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধন না হওয়ার কথা বলে কল্পনা ও অভীষ্ট সাধনের উন্মাদনার কথা বলে শিক্ষা কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু সদর্থক সুপারিশ করা হয়েছিল। সরকারি অকর্মণ্যতা অবহেলা ও সদিচ্ছার অভাবে তাও ব্যর্থ হয়েছিল। এরও দশ বছর পর ১৯৭৬ সালে রাজ্যগুলির অক্ষমতার দোহাই দিয়ে ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কেউই শিক্ষার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করল না। এমনকী ভিজিলেন্স কমিটির সুপারিশ ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারগুলিকে বাজেটের ৩০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে। সকলেই জানেন বাস্তবে তা হয়নি, কি কেন্দ্রীয় কি রাজ্য উভয় সরকারই শিক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তাই ১৯৭৬ থেকে দশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পেশ করল জাতীয় শিক্ষানীতি ‘ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন (এনপিই)’ যাতে ছিল অতীতের ভুলের স্বীকৃতি, নয়নভোলানো প্রতিশ্রুতি, মনোমুগ্ধকর বাক্যবিন্যাস। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে তখন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করে মুখোশের আড়ালে কীভাবে এই নীতি শিক্ষাসত্তাকে ধ্বংস করবে তা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে আমাদের দলের বিশ্লেষণ ফলতে দেরি হয়নি। অচিরেই এসেছিল ডিপিইপি (ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রজেক্ট) যার মূল উদ্দেশ্য ছিল গোটা দেশব্যাপী প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ চল্লিশোর্ধ্ব মহিলাদের শিশুশিক্ষার দায়িত্বে নিয়ে আসা, যার বিষময় প্রভাব শিশুশিক্ষায় অচিরেই দেখা গিয়েছিল। যদিও আমাদের স্মরণে রাখা দরকার যে আরও অনেক আগে ১৯৮১ সালে তৎকালীন সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছিল। এনপিই ১৯৮৬-র পথ ধরে ১৯৯০ সালে ডি এফ আই ডি (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্সট্রাকশনাল ডেভেলপমেন্ট)-এর কর্মসূচি হিসাবে ডিপিইপি এল, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পথ প্রদর্শক হিসাবে সিপিএম নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার খ্যাতি কুড়িয়েছিল। এন পি ই-র মূল দর্শন ছিল ‘এডুকেশন ইজ এ ইউনিক ইনভেস্টমেন্ট’। ডিপিইপি-র শিক্ষাদর্শনে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি পাওয়া গেল— (১) ফেলিং স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস উইল অ্যাড ফিনানসিয়াল লস’ অর্থাৎ ছাত্রদের ফেল করানো আর্থিক ক্ষতি। সুতরাং শিখুক না শিখুক ন্যূনতম জ্ঞানার্জন না হলেও উপরের ক্লাসে তুলে দাও।

(২) ‘রিপ্রোডাকশন ডিসিশনস আর লেফট টু পেরেন্টস, জেনারেলি সো দ্য প্রাইমারি রেসপনসিবিলিটি ফর চাইল্ড লার্নিং অ্যান্ড এডুকেশন মাস্ট রিমেইন উইথ দেম’। জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাবা-মার, অতএব সন্তানের শিক্ষার দায়িত্বও তাদের — রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

(৩) ‘দ্য শিফট অফ রেসপনসিবিলিটি অফ প্রাইমারি এডুকেশন হুইচ আনটিল নাও ওয়াজ উইথ দ্য গভর্নমেন্ট টু পিপলস সোল্ডার’— শিক্ষার খরচ সরকারের ঘাড় থেকে জনগণের ঘাড়ে চাপাও।

এরও দশ বছর পর ২০০০ সালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের রিপোর্টের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দুই শীর্ষ শিল্পপতি কুমার মঙ্গলম বিড়লা এবং মুকেশ আম্বানির উপর (এ পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর রিফর্ম ইন এডুকেশন)। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ঘটা করে পালন করার তিন বছরের মধ্যেই শিক্ষায় বেসরকারি পুঁজির অবাধ প্রবেশ ঘটানো হল। শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে লাভজনক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হল। এলপিপিপি মডেল (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ), বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ তো বটেই এমনকী বিদ্যালয় স্তরেও। আরও পাঁচ বছর পর ২০০৫ সালে এল ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এনসিএফ), তৈরি করা হল একটা বাতাবরণ যা এলপিজি (লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন) নীতিতে আবদ্ধ করল শিক্ষাক্ষেত্রকে।

স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যায়ে যে ভাবে দেশের শিক্ষার উপর একের পর এক আঘাত সরকারিভাবে এসেছে তা দেশের শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে ক্রমান্বয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রকৃত শিক্ষার দাবিতে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ক্রমশ ফেটে পড়ছে শিক্ষাব্রতী মহলে। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এক রাজ্য থেকে এক রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার বিস্তারের ইতিহাস যেমন গর্বের তেমনি শিক্ষার দাবিতে গণআন্দোলনেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম সারিতে। স্বাভাবিকভাবেই ’৮০-র দশকের গোড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য শিক্ষাবিদ সহ সকল স্তরের মানুষ সরকারি শিক্ষানীতির প্রতিবাদে সামিল হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন ঐতিহাসিক ভাষা শিক্ষা আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা ও পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে। এই আন্দোলনে সামিল ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, অধ্যাপক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সকলেই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্তাকুল কী করে শিক্ষা আন্দোলনকে দমন করা যায় তার রূপরেখা তৈরিতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কারণ দরিদ্র জনগণের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার দায় তাঁদের ছিল না। এই সময়েই তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার আচরণবিধি প্রণয়ন করে গেজেট প্রকাশ করেন ১৪ জানুয়ারি ২০০৫ সালে। লক্ষ্য একটাই— শিক্ষকদের সরকারের অনুগামী করা ও অবাধ্য প্রতিবাদী শিক্ষকদের শায়েস্তা করা।

শিক্ষকতা শুধু চাকরি বা পেশা নয়। একটা ব্রত, একটা আদর্শ— আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে মহৎ শিক্ষক হওয়া যায় না। যুগ-যুগান্তর ধরে বিভিন্ন সমাজে শিক্ষকরা নিজস্ব ভূমিকার মধ্য দিয়ে এই গৌরব অর্জন করেছেন। সমাজও শিক্ষকদের সেই মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। অভিভাবকরাও যুগে যুগে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের কাছ থেকে নীতি-নৈতিকতা-আদর্শ ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধগুলি আয়ত্ত করে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠবে এই আশায় নিশ্চিন্তে ভরসা করেই তাঁদের সন্তানদের শিক্ষকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। শিক্ষাপ্রেমী জনগণ এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছেন। শিক্ষিত তরুণ যুব সম্প্রদায় বছরের পর বছর কোথাও অর্থ না নিয়ে কোথাও নামমাত্র অর্থ নিয়ে সেই মহান ব্রত পালন করে গেছেন। গড়ে তুলেছেন আমাদের রাজ্যের প্রান্তে প্রত্যন্তে বিদ্যালয় সমূহ। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে ১২,৫০০ সরকার পোষিত বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে শুধুমাত্র সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা স্কুলের সংখ্যা একশোরও কম। শিক্ষা নিয়ে স্কুল গড়ে ব্যবসা করা যায়— এই ধারণা শিক্ষানুরাগী মানুষ কিছু দিন আগেও কল্পনা করতে পারতেন না। সিপিএম সরকারের আমলে ভ্রান্ত শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলেই আমাদের রাজ্যে স্কুল ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব ঘটেছে। সরকার অবাধে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের অনুমোদন দিয়েছেন ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় তৈরি করার। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই বিদ্যালয়গুলির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিভাবকদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল ভাবনা ‘আর্ন ম্যাক্সিমাম প্রফিট’ শিক্ষা ব্যবসাতেও থাবা বসিয়েছে। ফলে ব্যবসায়িক বিদ্যালয়ের মালিকরা সেইসব শিক্ষকদের নিযুক্ত করে যাদের দিয়ে অর্থের লোভ দেখিয়ে নীতিহীন আদর্শহীন কাজও বাগিয়ে নেওয়া যায়। এই সব আদর্শহীন শিক্ষকদের দু-একজনের অসামাজিক কার্যকলাপকে সামনে রেখে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা-কটূক্তি, অসম্মানজনক উক্তি আমদানি হয়েছে বিগত সরকারের আমল থেকে। জনমানসে শিক্ষক সমাজকে হেয় করে শিক্ষকদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আচরণবিধি চালু করেছিল। এমন সব বিষয় ওই কোড অফ কন্ডাক্ট-এ ছিল যা অত্যন্ত অসম্মানজনক। উল্লেখ ছিল, স্কুলের ভিতরে মদ্যপান করা চলবে না। গোটা শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এর কোনও নজির আছে কি? এই উল্লেখ কি শিক্ষকদের পক্ষে সম্মানজনক? উল্লেখ ছিল, রিফ্রেন ফ্রম অ্যাকসেপটিং এনি গিফট। এ তো ঘুষের অভিযোগ! স্কুলে স্কুলে এসব ঘটছে না কি? এতো সমস্ত শিক্ষক সমাজকে অসম্মান করা। ওই কোড অফ কন্ডাক্ট-এ একটা ধারাই ছিল প্রোহিবিশন রিলেটিং টু গ্যাম্বলিং অর কনসাম্পশন অফ ইনটক্সিক্যান্ট। ঘটনা কি তাই? স্কুলে স্কুলে জুয়া, মদ এসব চলছে? আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

প্রতিবাদী শিক্ষকদের মুখ বন্ধ করতেই কি বর্তমান সরকার বিগত সরকারের প্রশস্তি গেয়ে নতুন মোড়কে কয়েকটি বিষয় জুড়ে দিয়ে নবরূপে আচরণবিধি আনলেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠছে। সম্প্রতি গেজেট বিজ্ঞপ্তির পর শিক্ষামন্ত্রী না দেখে না শুনে কিছু বলবেন না বলে জানালেন। পরে আধিকারিকদের কাছ থেকে শুনে প্রতিক্রিয়া দিলেন, সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার যে আচরণবিধি এনেছিল বেশিরভাগটাই এক আছে। যিনি সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি সহ প্রায় সকল প্রশ্নেই এককালে বিরোধী ছিলেন আজ শিক্ষকদের আচরণবিধি প্রণয়নের প্রশ্নে তিনি তাঁদের কাজের সাফাই গাইছেন কেন? আসলে বিগত দিনের বিরোধী দলনেতাও আজ শাসককুলের অন্যতম শিরোমণি। আমরা জানি শাসকের কাজই হল বিরুদ্ধ কণ্ঠকে স্তব্ধ করা। তারা চিরকাল চেষ্টা করেছে প্রতিবাদীদের থেকে প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নিতে। এই প্রশ্নে তৃণমূল সরকারের সাথে অতীতে সিপিএম সরকারের কোনও পার্থক্য নেই। তাই শিক্ষামন্ত্রী অবলীলায় বলেছিলেন, এ তো বামফ্রন্টই এনেছিল, তঁারা শুধু আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করেছেন মাত্র। এ বারের আচরণবিধিতে নতুন করে এল কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা সরকারের অনুমতি বিনা কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতি বছরের সম্পত্তির খতিয়ান এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। সবচেয়ে মারাত্মক যে ধারাটি এসেছে, তা হল ‘নো টিচার

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে

ডি আই এবং জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন

আগামী শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফেরানোর দাবিতে ২০-২১ ডিসেম্বর অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হল ডিএম এবং ডিআই দপ্তরে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষদের অবস্থান ও গণডেপুটেশন। ২১ ডিসেম্বর কলকাতার ডিআই দপ্তরে এই কর্মসূচিতে কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন, আন্দোলন শিথিল করা চলবে না। কারণ শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার পরেও ধোঁয়াশা কাটেনি।

কলকাতা

কোচবিহার

অবস্থানে উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের পক্ষে তপতী মিত্র, আশিস বসু, শম্পা সরকার ও প্রদীপ প্রামাণিককে নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই ডিআই-এর হাতে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির জেলা সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী সহ অরুণ দত্ত, অমিয় জানা, সুমিতা মুখার্জী, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন বনশ্রী চক্রবর্তী।

তমলুক পৌরসভায় নাগরিকদের বিক্ষোভ

তমলুকে পৌরকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং রাস্তা-ড্রেন সংস্কার, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল গ্রাউন্ডে প্রাতর্ভ্রমণকারীদের প্রবেশ ফি ধার্য না করা প্রভৃতির দাবি জানিয়ে ৪ ডিসেম্বর পৌর নাগরিক সমিতির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যানের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। বিক্ষোভ-ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক মানব বেরা। প্রতিনিধিত্ব করেন যুগ্ম সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কারক, প্রণব মাইতি প্রমুখ। অবস্থানে বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন রঞ্জিত জানা। চেয়ারম্যান দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা, ১০০ দিনের কাজ, এম এস কে বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, বিনামূল্যে শৌচালয় ইত্যাদির দাবিতে ১৯ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বহু মানুষ এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পঞ্চায়েত প্রধানের হাতে দাবিপত্র প্রদান করেন কমরেডস দেবসর বেসরা, রঞ্জিত হেমব্রম, সুনীল মুর্মু প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমর চৌধুরী।

রাস্তা সংস্কার ও রেশন সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ১৯ ডিসেম্বর বিক্ষোভ দেখান কয়েকশো মানুষ। তাঁদের দাবি, ব্লকের সমস্ত বেহাল রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে, কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্লক এলাকার সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা, ষাটোর্ধ্ব সকল ব্যক্তিকে বার্ধক্যভাতা দিতে হবে এবং মদ ও ড্রাগ ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

এস ইউ সি আই (সি) দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত দাসের নেতৃত্বে আট জনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় জয়েন্ট বিডিও তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত সমস্যাগুলি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বিডিও অফিসের গেটে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস অরুণ জানা, বাসুদেব সামন্ত, প্রবীর প্রধান, অশোক মাইতি, হেয়াতুল হোসেন প্রমুখ।

পান চাষিদের নানা দাবিতে কনভেনশন

পান চাষিদের উপর আড়তদার ও পাইকারদের জুলুমবাজি বন্ধ, পানকে কৃষিপণ্য হিসাবে স্বীকৃতি, পান সংরক্ষণের জন্য জেলায় হিমঘরের ব্যবস্থা সহ পান চাষিদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন শক্তিশালী করতে ২১ ডিসেম্বর শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের রামতারকহাটে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তিন শতাধিক পান চাষি যোগ দেন। ইতিপূর্বে ১১ ডিসেম্বর আড়তদাররা পান কেনার ক্ষেত্রে কমিশন শতকরা ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ টাকা করায় নিমতৌড়ি বাজারে পান চাষিরা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের ফলে ব্যবসায়ীরা বিনা নোটিশে পান বাজার বন্ধ করে দিলে সমিতির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কনভেনশনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নন্দ পাত্র, তপন ভৌমিক প্রমুখ। পান চাষিদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনকে পরিচালনার জন্য বিবেক রায়কে সভাপতি ও সোমনাথ ভৌমিককে সম্পাদক করে ৭২ জনের শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কৃষিমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

খড়্গপুরের প্রধান ডাকঘর তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

খড়্গপুর (বোগদা) ডাকঘর বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে পোস্ট অফিসের সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্টের সামনে ৪ ডিসেম্বর অবস্থান-বিক্ষোভ পালিত হয়। এলাকার বহু বিশিষ্ট নাগরিক, পেনশন প্রাপক ও সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। গৌরীশঙ্কর দাস (এ আই ইউ টি ইউ সি), অনিল দাস (সিটু) প্রমুখ বক্তারা বলেন, ডাক ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের লক্ষ্যেই ডাকঘর তুলে দেওয়ার এই ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে না পেরে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বেআইনি বিদ্যুৎ বিল রুখল অ্যাবেকা

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ১ নং সেক্টর কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর ১ নং সজলধারা প্রকল্পে জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ২০১৬-র বিদ্যুৎ বিল পাঠানো হয় যথাক্রমে ১৩,০০০ টাকা, ১৩, ১১৭ টাকা, এবং ১৩,১১৭ টাকা। নির্দিষ্ট তারিখের পরে হলে তা দিতে হবে যথাক্রমে ১৯,১৮০ টাকা, ১৯,১৯৫ টাকা এবং ১৯,১৯৫ টাকা। অ্যাবেকা নেতৃত্বের পরামর্শে রিজিওনাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল অফিসারের কাছে অভিযোগ করা হলে, বিদ্যুৎ অফিস রাতারাতি বিল কমিয়ে তিনটি বিলেই ১৬,৭০৫ টাকা ধার্য করে। বাধ্য হয়ে গ্রাহক এই টাকা জমা করেন এবং কোন ধারা অনুযায়ী এটা করা হচ্ছে তা জানতে চান। দীর্ঘদিন পর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জানান, নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিল মেটানো হলে তা বাণিজ্যিক রেট অনুযায়ী নেওয়া হয়। এই চরম বেআইনি ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ওমবুডসম্যান-এর কাছে অভিযোগ জানানো হয়। তিনি বলেন, এটি সম্পূর্ণ বেআইনি। এবং নিয়ম মেনে লেট পেমেন্ট সারচার্জ দাবি না করে নতুন করে বিল করার নির্দেশ দেন।

অ্যাবেকার বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, তথ্য জানার অধিকার আইনের সাহায্যে গত পাঁচ বছরে এই ধরনের ভুয়া বিল কী পরিমাণ নেওয়া হয়েছে এবং বর্ধিত টাকা কোথায় যাচ্ছে তা তাঁরা জানতে চাইবেন। সাথে সাথে এই ধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলনেও নামবেন।

বারুইপুরে বিক্ষোভ

সূর্যপুর ঘাট থেকে রতনপুর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার কাজ, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, সকলের রেশনকার্ড, লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান প্রভৃতি দাবি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর ব্লকের বলবলিয়া গ্রামের অধিবাসীরা ২০ ডিসেম্বর গ্রামোন্নয়ন কমিটির নেতৃত্বে বিডিওকে ডেপুটেশন দেন। নেতৃত্বে ছিলেন হানিফ মণ্ডল, ইয়াসিন লস্কর, মহসিন লস্কর প্রমুখ।

পাশফেল চালুর দাবিতে ছাত্রদের পার্লামেন্ট অভিযান

অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশফেল চালুর দাবিতে এ আই ডি এস ও ১-৭ ডিসেম্বর 'দাবি সপ্তাহ' এবং ১৫ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে রাজ্যে মিছিল, অবস্থান, বিক্ষোভ, ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালন করে। এতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যণীয়। সাধারণ মানুষের সমর্থনও ছিল ব্যাপক।

২১ ডিসেম্বর এই দাবিতেই সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল এআইডিএসও। অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও প্রায় পাঁচশত ছাত্র রামলীলা ময়দানের কাছে গুরু নানক আই হসপিটালের সামনে থেকে মিছিল শুরু করামাত্র বিশাল পুলিশবাহিনী গতিরোধ করে। এক মাস আগে থেকে এই কর্মসূচি পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও তারা মিছিল করতে বাধা দেয়। রাস্তাতেই বিক্ষোভ-সভা শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই। বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড ভাস্করানন্দ, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড শচীন জৈন, সর্বভারতীয় কার্যালয় সচিব কমরেড চঞ্চল ঘোষ, হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড হরিশ কুমার, দিল্লি রাজ্য সভাপতি কমরেড প্রশান্ত কুমার, রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড রাহুল সরকার, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য কমরেড শ্রুতি শিবহরি। শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা সেভ এডুকেশন কমিটির দিল্লি রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিবাশিস প্রহরাজের নেতৃত্বে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে গিয়ে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন। ছবি প্রথম পাতায়।

ঝাড়গ্রামে শিক্ষাব্রতী পাঁচকড়ি দে-র মূর্তি উদ্বোধন

আজীবন শিক্ষাব্রতী, নিঃস্বার্থ সমাজসেবী দুই মেদিনীপুর সহ জঙ্গলমহল এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব প্রয়াত পাঁচকড়ি দে-র পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল তাঁর ১১৪তম জন্মদিন ১৪ ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম স্টেশন ও হেড পোস্ট অফিস সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। অতি বিরল ও দৃষ্টান্তমূলক তাঁর মহৎ জীবনকে স্মরণ এবং এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের মানুষের যে অপরিশোধ্য ঋণ তা স্বীকার করার লক্ষ্যেই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা বলেই শিক্ষাব্রতী পাঁচকড়ি দে স্মৃতি রক্ষা কমিটির তরফে সম্পাদক সুকুমার গিরি জানিয়েছেন।

পাঁচকড়ি দে তাঁর সমগ্র জীবন শিক্ষা বিস্তারের কাজেই উৎসর্গ করেছিলেন। নিজে উদ্যোগ নিয়ে, এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একের পর এক স্কুল স্থাপন করেছেন। শিক্ষকতার জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরেও তাঁর নিজের বাসভবন সংলগ্ন জমি এবং সারা জীবনের সঞ্চয়, অবসরকালীন ভাতা এক কথায় তার যথাসর্বস্ব দিয়ে মূক ও বধিরদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যেও তিনি ছিলেন সদা সক্রিয়। মানুষের সত্যিকারের উপকার করার মনোভাব থেকেই তিনি ১৯৬৭ সালে ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্ত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। আশির দশকে রাজ্য সরকারের ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন কমিটির সভাপতি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গুণধর মাহাত। বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ সুহৃদ ভৌমিক, অধ্যক্ষ আশিস গুপ্ত, দুর্গেশ মল্লদেব, কমল সাঁই প্রমুখ। এই উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। মূর্তিটি নির্মাণ করেন মেচেদায় অবস্থিত তাপস দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্টের বিশিষ্ট ভাস্কর অসিত সাঁই। তিনিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রীমৃত্যুর প্রতিবাদে ঘাটশিলায় ছাত্রবিক্ষোভ

সম্প্রতি ঘাটশিলায় এক স্কুল ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। গত কয়েক মাস ধরে কলকাতায় থেকে সে পড়াশুনা করছিল। বাবুঘাটে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই মৃত্যু রহস্যের কিনারার দাবিতে ঘাটশিলাতে ডিএসও-র উদ্যোগে এক বিশাল ছাত্রমিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়।

হরিয়ানায় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃষকদের দাবিপত্র পেশ

সঠিক সময়ে ইউরিয়া সার সরবরাহ, সারের দাম কমানো, সার পাওয়ার ক্ষেত্রে আধার কার্ডের জটিলতা দূর করা, ফসলের ন্যায্য দাম এবং খেত মজুরদের সারা বছরের কাজের দাবিতে এ আই কে কে এম এসের পক্ষ থেকে ২১ ডিসেম্বর হরিয়ানার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে এক দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে।

আগরতলায় শরৎচন্দ্র স্মরণ

ভারতের নবজাগরণের পার্থিব মানবতাবাদী ধারার অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪১ তম জন্মবার্ষিকী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আগরতলার শরৎ সংস্কৃতি পরিষদ। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও স্মরণিকা প্রকাশ এইগুলির মধ্যে অন্যতম।

এই জন্মবার্ষিকীর সমাপ্তি হিসাবে ২৩ ডিসেম্বর প্রীতিলতা সভাগৃহে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং নৃত্য পরিবেশিত হয়। শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ গীতা দেবনাথ, ডঃ প্রণব বর্ধন, অরুণ ভৌমিক প্রমুখ। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সুভাষকান্তি দাস। সভাপতিত্ব করেন কমল রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরিষদের সম্পাদক মিলন চক্রবর্তী।

কাকোরির শহিদ স্মরণ

রাজস্থান ঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদ রামপ্রসাদ বিসমিল ও শহিদ আসফাকাউল্লা খান স্মরণ দিবস উপলক্ষে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে রাজস্থানের জয়পুরে ২০ ডিসেম্বর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার শহিদদের সংগ্রাম এবং তাঁদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরেন। এ ছাড়া রাজস্থানে হিন্দুত্ববাদী শম্ভুলাল রাগার কর্তৃক নিরীহ মহম্মদ আফরাজুলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়।

দুরগ ঃ ২১ ডিসেম্বর মহান বিপ্লবী আসফাক উল্লা খান, রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী এবং ঠাকুর রোশন সিংহের শহিদ দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালিত হয় ছত্তিশগড়ের দুরগে। এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই ডি এস ও-র সদস্যরা মাল্যদান করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে এক সভায় সংগঠনের সদস্যরা বিপ্লবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার অঙ্গীকার করেন।

ওড়িশার ঢেংকানলে শহিদ স্মরণ

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভ

প্রতাপগড়, মোরাদাবাদ, জৌনপুর, এলাহাবাদ (উপর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে)

শিক্ষকদের আচরণবিধি

তিনের পাতার পর

অর নন-টিচিং স্টাফ শ্যাল মুভ এগেইনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট অর দ্য কমিশন অফ স্কুল (সেকেন্ডারি) এডুকেশন অর দ্য বোর্ড অর দ্য ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস সেকেন্ডারি এডুকেশন, অর দ্য অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস (এস ই) অ্যাজ দ্য কেস মে বি, টু এনি কোর্ট অফ ল, উইদাউট সার্ভিস অফ রিট্ন রিপ্রেজেন্টেশন আপঅন দ্যা কনসার্নড অথরিটি অ্যান্ড অ্যাফোর্ডিং সাচ অথরিটি। এ রিজনবল অপরচুনিটি টু ডিসপোজ অফ দ্য সেম। এ তো মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার সামিল! কোনও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী যদি অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তা হলেও যাঁরা তাঁকে বঞ্চিত করেছেন তাঁদেরই কাছে আবেদন করতে হবে ও জানাতে হবে। মানসিক পীড়ন সহ্য করেও সময় দিতে হবে অথচ আইনের দ্বারস্থ হতে পারবেন না। এ কী হয়! এ ছাড়াও নতুন আচরণবিধিতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। অবসরের দিন থেকে তিন বছর পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা আছে। কোথায় নামাচ্ছেন তাঁরা প্রবীণ শিক্ষকদের। নাকি এইসব নিয়ম করে ভয় দেখিয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের তাঁরা নিজেদের তাঁবে আনতে চাইছেন?

এমনভাবে বিষয়গুলি আসছে যেন মনে হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা কোনও নিয়ম নীতি মানছেন না। শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি কোনও রকম স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা নেই, সর্বত্রই তাঁরা যেন সমাজবিরোধী গুন্ডা বদমায়েশের প্রতিমূর্তি। আসলে এই মরণোন্মুখ অবক্ষয়িত পুঁজিবাদ সুপরিকল্পিত ভাবে তার সংকট জর্জরিত অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে এই নোংরা পথ বেছে নিচ্ছে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে সুন্দরতম সম্পর্ক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে নষ্ট করতে চাইছে, কালিমালিপ্ত করছে গোটা শিক্ষক সমাজকে। এ এক ভয়ানক অবস্থা। নবজাগরণের মহান মনীষী রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ সহ যাঁরা এ দেশে কূপমণ্ডুক চিন্তা-ভাবনা, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার দূর করে গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষকদের উপর সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব ও প্রচেষ্টায় ব্রতী করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করতে আনা হচ্ছে একের পর এক আচরণবিধি। কালিমালিপ্ত করে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আটকে দেওয়া হচ্ছে প্রেরণাদায়ক জীবনসংগ্রামে নিবিষ্ট আদর্শ শিক্ষককুলকে। অথচ আজও পেশাগত নৈতিকতার মানদণ্ডে অসাধারণ অনুকরণযোগ্য উদাহরণের অভাব নেই। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সেই উদাহরণগুলিকে সামনে আনা হচ্ছে না।

শাসক শ্রেণি পুঁজিবাদের স্বার্থে এ কাজ করবে না, এ দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবেই বর্তাবে সেইসব শিক্ষকদের উপর যাঁরা পেশাগত নৈতিকতায় প্রশ্নহীন, আচরণ ও অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধার যোগ্য, সত্য প্রতিষ্ঠায় জীবন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁরা কখনওই সরকারের এই ধরনের কর্মকাণ্ড সমর্থন করবেন না, বরং গড়ে তুলবেন তীব্র আন্দোলন।

আরএসএস-জুজু দেখাচ্ছে সিপিএম

একের পাতার পর

বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আমাদের দল সর্বশক্তি নিয়োগ করে আন্দোলন চালিয়েছে। কিন্তু এ দেশের মানুষের সার্বজনীন শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীদের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে সিপিএম সরকার শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছে। তারা শেষপর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালু করতে বাধ্য হলেও পাশ-ফেল চালু করেনি। তার পরে সারা দেশে কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে বিজেপি সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেয়। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও কেন্দ্রীয় আইনের দোহাই দিয়ে এ রাজ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেয়। ফলে গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার মূলোচ্ছেদ প্রতিহত করতে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালুর দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং তীব্র আকার ধারণ করে। বিশেষ করে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবিতে গত ১৭ জুলাই যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়, তা ব্যাপক অংশের মানুষের সমর্থন পায়। এরই চাপে রাজ্য সরকার যখন পাশ-ফেল চালুর কথা ঘোষণা করেছে, তখন সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি বামপন্থী নামধারী দলগুলির বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল চালুর বিরোধিতা করে তৃণমূল সরকারকে আরএসএস 'জুজুর' ভয় দেখিয়ে পাশ-ফেল চালু না করার যে প্ররোচনা দেওয়া হল, তা এ রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি চরম প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল তুলে দিয়ে শিক্ষার বনিয়াদ ধ্বংস করার জন্য শাসক-শোষক শ্রেণি যে চক্রান্ত করছে, তাকে রূপদানের ক্ষেত্রে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপির কোনও তফাৎ নেই। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং এই শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানাচ্ছি।"

গণদাবী
নতুন ওয়েবসাইট
www.ganadabi.com

'গুজরাট মডেল' কী জিনিস

একের পাতার পর

হারিয়ে গেলেন কেন? বক্তৃতায় কোথাও 'আচ্ছে দিনে'র উল্লেখ পাওয়া গেল না কেন? বহু প্রচারিত তাঁর সেই 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' স্লোগানই বা মোদি কিংবা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা এবার তুললেন না কেন? কেন জেতার জন্য তাঁদের শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতারই আশ্রয় নিতে হল?

স্বাধীনতার সাত দশক ধরে বঞ্চিত হতে হতে, প্রতারিত হতে হতে সংকটের আবর্তে পড়া মানুষ বিজেপির 'বিকাশ' আর 'আচ্ছে দিনে'র সর্বগ্রাসী প্রচারকে খড়কুটোর মতো চেপে ধরতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, বিজেপি নেতাদের প্রতিশ্রুতি যদি সত্যি হয়! নিদারুণ বাস্তব মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে, এ সবের কোনওটিতেই বিন্দুমাত্র সত্যি নেই, সবই 'জুমলা'— গদি দখলের জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মাত্র। গরিব মানুষ, গ্রামীণ মানুষ, শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্ত মানুষ বিজেপি শাসনের কয়েক বছরেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন গুজরাট মডেল আসলে কী ভয়ঙ্কর এক মডেল! মানুষ যে তাদের প্রতারণা ধরে ফেলেছে তা বুঝতে বাকি থাকেনি বিজেপি নেতাদেরও। তাই আর 'উন্নয়ন', 'বিকাশ' বা 'আচ্ছে দিন'-এর ধারপাশ মাড়াননি তাঁরা। আঁকড়ে ধরেছেন হিন্দুত্ববাদের নগ্ন সাম্প্রদায়িক প্রচারকে।

নির্বাচনী ফলে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ গুজরাটে বিজেপি গো-হারান হেরেছে। আমেদাবাদ, সুরাট, বডোদরা, রাজকোট— এই চারটি শহরকেন্দ্রিক জেলার ৫৫টি আসনের মধ্যে ৪৬টিতে জিতেছে বিজেপি। এর বাইরে ১২৭টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৭১টি। অর্থাৎ গ্রামীণ গুজরাট বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তথাকথিত গুজরাট মডেলে উন্নয়নের যা সুফল তা গুজরাটের গ্রামীণ মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, কৃষক-শ্রমিক কারও ভাগ্যে জোটেনি। শহরগুলি যখন আলোয় ঝলমল করছে, হাইওয়ে, উড়ালপুল, ব্রিজে ছেয়ে যাচ্ছে, স্মার্ট সিটি, ডিজিটাল সিটি নামের চমক দিচ্ছে, গ্রামীণ গুজরাটে তখন তুলোর দাম না পেয়ে, ঋণ-জর্জরিত হয়ে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। পানীয় জলের জন্য মানুষ মাইলের পর মাইল হাঁটছে। প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে চাষিরা ফসলের ন্যায্য দাম পাবে। জল-সংকটে হাহাকার করা এলাকাগুলিতে নর্মদার জল পৌঁছে দেবেন। সারা দেশের মতো গুজরাটের চাষিরাও ফসলের দাম পায়নি, নর্মদার জলও আসেনি। শিল্পপতিদের জন্য অঢেল ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ কৃষকদের জন্য মহাজনই ভরসা। স্কুল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ভগ্নদশা। বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, গুজরাটকে শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলবেন, যেখানে রাজ্যের বেকাররা কাজ পাবে। শিল্প যতটুকু হয়েছে তাতে লাভবান হয়েছে শুধু আদানির মতো মুষ্টিমেয় শিল্পপতিরাই। বেকারদের কাজ জোটেনি। মালিকরা বিনামূল্যে কিংবা জলের দামে জমি পেয়েছেন, জল বিদ্যুৎ আর নানা রকম ট্যাক্সে হরেক রকম ছাড় পেয়েছেন। শিল্প-আইন গুজরাটে যা আছে তাতে শ্রমিকদের কোনও অধিকারই নেই, যথেচ্ছ শোষণের অবাধ ছাড়পত্র মালিকদের হাতে। ন্যূনতম মজুরি আইন গুজরাটে কার্যকর হয় না। আধুনিক শিল্পে চাকরিও নেই। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে গুজরাট মডেলের মোহ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে নির্বাচনে। এমনকী জীবনের সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজেপির নগ্ন সাম্প্রদায়িক প্রচারও কাজ করেনি, যা করেছে শহরের সচ্ছল সুবিধাভোগী মানুষের মধ্যে।

প্রধানমন্ত্রী যতই নিজেকে চা-ওয়ালা বলে প্রচার করুন, বাস্তবে তিনি কিংবা তাঁর দল যে এ দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করে চলেছেন, তা গুজরাটের গরিব সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন। তার মানে এই নয় যে, কংগ্রেসের প্রতি কোনও আস্থা থেকে মানুষ তাদের ভোট দিয়েছে। নিরুপায় মানুষ কোনও যথার্থ বিকল্প না পেয়ে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেসকে ভোট দিতে। বিজেপির প্রতি মানুষের ক্ষোভ বুঝে কংগ্রেস নেমে পড়েছিল একই রকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি নিয়ে মানুষকে প্রতারিত করতে। ক্ষমতায় এলে দশ দিনের মধ্যে কৃষিঋণ মকুব করবেন, এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। বিজেপি নেতাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন তিনি হিন্দু মন্দিরে গিয়ে মাথা ঠেকানোর। একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি গুজরাটে বিজেপির সবচেয়ে বড় অপরাধ ২০০২ সালে ধর্মের নামে ভয়ঙ্কর সংখ্যালঘু হত্যার। পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম সাধারণ মানুষের বিজেপি বিরোধী মনোভাবকে খেয়াল করেই কংগ্রেসকে এবার ব্যাপক প্রচার দিয়েছে, রাহুল গান্ধীকে বিকল্প নেতা হিসাবে তুলে ধরেছে। অসচেতন, নিরুপায় মানুষ বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের প্রচারে আবার বিভ্রান্ত হয়েছে।

তবে কি এমনই চলতে থাকবে? শোষিত বঞ্চিত মানুষ ফুটবলের মতো একবার কংগ্রেসের পায়ে আর একবার বিজেপির পায়ে গড়াগড়ি খেতে থাকবে? বাস্তবে তাই ঘটবে যতদিন না মানুষ এই দলগুলির জনবিরোধী চরিত্র, শ্রেণিচরিত্র ধরতে পারবে। যে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার মানুষ এ ধরনের সমস্ত রকম শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়েছিল, সেই বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন বলেছিলেন, "জনগণ বরাবরই রাজনীতিতে প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ শিকার হয়ে এসেছে এবং সর্বদা হতেই থাকবে যতদিন না তারা সকল নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণাবলি এবং প্রতিশ্রুতিগুলির পিছনে কোন বা কোন কোন শ্রেণির স্বার্থ কাজ করছে তা খুঁজে বের করতে শিখবে।" গুজরাটের বেশিরভাগ মানুষ এটা ধরতে পারেনি যে শ্রেণি চরিত্রের দিক থেকে কংগ্রেস এবং বিজেপি দুটি দলই বুর্জোয়া তথা পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দল।

এ রাজ্যেও কিছু মানুষ বিজেপির এই শ্রেণিচরিত্র ধরতে না পেরে, তার নীতি, কার্যকলাপ, নেতাদের চরিত্র কোনও কিছুরই বিচার না করে এবং একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস অন্য দিকে সিপিএমের প্রতি বিরক্ত হয়ে মনে করছেন বিজেপি বোধহয় তাঁদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারবে। তাঁদের সামনে গুজরাটের মানুষের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, এই দল সাধারণ গরিব নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যার কোনও সমাধানই করতে পারে না, বরং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের সংহতিকেই দুর্বল করে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং বুঝতে হবে কোন দল সত্যিই তাদের মুক্তিসংগ্রামের সাথি, কারা তাদের সত্যিই শোষণ থেকে বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতে চায়, তাদের চিনতে হবে, তাদের শক্তিশালী করতে হবে। তা না করে তাঁরা যদি শুধু স্রোতে ভাসতে চান, বড় দল খোঁজেন, নামকরা নেতা-মন্ত্রী খোঁজেন, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হন এবং তাদের উপরই নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিয়ে 'নির্ঝঞ্ঝাট' জীবন কাটাতে চান, তবে অতীতের মতোই আবারও তাঁরা ঠকবেন এবং তারপর আবার বলবেন, ও সব দলই সমান এবং রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই সব পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলিরই সুবিধা করে দেবেন। যত কঠিন হোক, তাঁদের শ্রেণিচরিত্র, শ্রেণিস্বার্থ বুঝতে শিখতে হবে, শ্রেণি সংগ্রামে সামিল হতে হবে, না হলে এমন করেই তাঁরা বারে বারে প্রতারণার শিকার হবেন।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ঐতিহ্য অটুট রাখতে হবে জিম্বাবোয়ের জনগণকে

প্রেসিডেন্ট মুগাবের পদত্যাগ

জিম্বাবোয়ের প্রেসিডেন্ট পদ ও জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (জানু-পিএফ) দলের ফার্স্ট সেক্রেটারির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন আফ্রিকার দেশগুলির ঐক্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘদিনের নেতা রবার্ট গ্যাব্রিয়েল মুগাবে। তাঁর পদত্যাগের জন্য দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই মূলত দায়ী বলে সংবাদমাধ্যমে প্রচার চললেও পিছনে থেকে গেছে অনেক কথা।

জিম্বাবোয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুগাবে

আফ্রিকা মহাদেশ বহু বছর ধরে ইউরোপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লুণ্ঠনক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এখানকার মূল্যবান খনিজ সম্পদ আর সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে মুনাফার ভাণ্ডার ভরিয়েছে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা, আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ কালো মানুষকে দাস হিসাবে ইউরোপ-আমেরিকায় চালান করেছে। জিম্বাবোয়ে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত। ১৯৮০ পর্যন্ত দেশটির নাম ছিল রোডেশিয়া। ১৮৭০-এর দশকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সিসিল রোডেশ এখানকার মূল্যবান হিরে লুঠ করে তৈরি করেছিলেন 'ডি বিয়ার্স মাইনিং কোম্পানি'। তাঁর নাম থেকেই আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের এই দেশটির নাম হয়েছিল রোডেশিয়া। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের দল ক্রমে ক্রমে জিম্বাবোয়ের আদি বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে সেখানকার কৃষিজমি দখল করতে থাকে। ১৯১৪ সালের মধ্যে জিম্বাবোয়ের বিপুল পরিমাণ জমি চলে আসে ব্রিটিশ দখলদারদের কব্জায়। রোডেশিয়ার জমিতে খাদ্যশস্যের বদলে চাষ হতে থাকে তামাকের মতো বাণিজ্যিক ফসল যা বিক্রি করে বিপুল মুনাফা লুটতে থাকে শ্বেতাঙ্গরা। অন্যদিকে সেখানকার আদত বাসিন্দা গরিব কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ মরতে থাকে খাদ্যের অভাবে।

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসময় রুখে দাঁড়ায় জিম্বাবোয়ের মানুষ। শুরু হয় স্বাধীনতার লড়াই। সেই লড়াইয়ে তরুণ বয়সেই যুক্ত হয়েছিলেন মুগাবে। ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে ও '৬০-এর দশকের প্রথম দিকে পশ্চিম আফ্রিকার ঘানাতে গিয়ে পড়াশোনা করেন মুগাবে। শিক্ষকতায় যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ঘানা তখন ছিল আফ্রিকার দেশে দেশে মানুষের ঐক্যবদ্ধতার আন্দোলন তথা প্যান-আফ্রিকানিজমের উৎসস্থল। ব্রিটিশ শাসক দশ বছর মুগাবেকে জেলবন্দি করে রাখে। মুক্তি পাওয়ার পর জানু-র সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে তাঁকে তানজানিয়া ও মোজাম্বিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে জশুয়া নকোমোর নেতৃত্বাধীন জাপু (জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়ন) দলের সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে মুগাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ১৯৮০-তে দক্ষিণ রোডেশিয়ায় নির্বাচন হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসে, প্রধানমন্ত্রী হন মুগাবে। পাঁচ বছর পর '৮৫-তে জিম্বাবোয়ে প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে সামনে আসে জানু-পিএফ। '৮৭ সালে জানু ও জাপু ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসক দল হিসাবে কাজ চালাতে শুরু করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন রবার্ট মুগাবে।

ক্ষমতায় বসে প্রেসিডেন্ট মুগাবে ২০০০ সালে শ্বেতাঙ্গদের দখল করা কৃষিজমি অধিগ্রহণের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। উদ্ধার করা জমি দেশের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের হাতে তুলে দেন তিনি। এঁরাই ছিলেন সেইসব জমির ন্যায্য অধিকারী। এই কৃষ্ণাঙ্গ চাষিরাই ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুগাবের সাথী। মুগাবের এই পদক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। ২০০২ সালে তাঁরা জিম্বাবোয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাতে দমে যাননি মুগাবে। ২০০৯ সালে তিনি স্বদেশীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আইন (আই ই ই এ) প্রণয়ন করেন। এই আইনে বিভিন্ন কোম্পানির ৫১ শতাংশের মালিকানা জিম্বাবোয়ের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের হাতে রাখার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল জিম্বাবোয়ের অর্থনীতিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির আধিপত্য থেকে মুক্ত করা। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয় সাম্রাজ্যবাদীরা। মুগাবের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে তাদের পরিচালিত মিডিয়া। প্রেসিডেন্ট মুগাবের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের নানা অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে তোলা হতে থাকে। তা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর সংগ্রাম এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে শুধু জিম্বাবোয়ে নয়, গোটা আফ্রিকার স্বদেশপ্রেমী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষই মুগাবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

প্রেসিডেন্ট পদ থেকে মুগাবের অপসারণ

জিম্বাবোয়ের বর্তমান সমস্যার শুরু এ বছর নভেম্বরে। একটি যুবসভায় ভাষণরত প্রেসিডেন্টপত্নী গ্রেস মুগাবেকে কিছু লোক অপদস্থ করে। এর পরেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট মানগাগওয়াকে পদচ্যুত করে সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয় প্রেসিডেন্টের দপ্তর। বলা হয়, মানগাগওয়ার নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠী মুগাবেকে হঠাতে চাইছে এবং তারাই রয়েছে গ্রেসের হেনস্থার পিছনে। কমপক্ষে আরও ১০০ জন কর্মীকেও দল থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে খবর প্রচারিত হতে থাকে। এর বিরুদ্ধে ১৩ নভেম্বর জিম্বাবোয়ের সেনাবাহিনীর কম্যান্ডার জেনারেল কন্সটানটিনো চিওয়েঙ্গা ৯০ জন মিলিটারি-অফিসারকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, এই বহিষ্কার পর্ব বন্ধ করা না হলে তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন।

ইতিমধ্যে বিদেশি সংবাদসংস্থা ও সোস্যাল মিডিয়া প্রচার করতে থাকে যে, রাজধানী হারারের রাস্তায় মিলিটারি ট্যাঙ্ক টহলদারি চালাচ্ছে। যদিও ১৫ নভেম্বর সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল টেলিভিশনে ঘোষণা করেন, দেশে কোনও সেনা-অভ্যুত্থান হয়নি। ১৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, জানু-পিএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০ নভেম্বরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট মুগাবেকে পদত্যাগ করতে হবে। এত কিছু সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট মুগাবে পদত্যাগ করতে চাননি। শেষপর্যন্ত তাঁর নিজের দলই পার্লামেন্টে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব আনে। জিম্বাবোয়ের জাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠনও মুগাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। হারারের রাস্তায় প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল হয়। শেষপর্যন্ত পদত্যাগপত্র পেশ করেন প্রেসিডেন্ট মুগাবে। হারারের রাস্তায় উল্লসিত জনতার উৎসবের ছবি প্রচার করতে থাকে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম।

উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদীরা

মুগাবেকে জানু-পিএফ দলের নেতৃত্ব এবং প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) এই খবর প্রকাশ করতেই লন্ডনের সরকারি মহলে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের পুরনো উপনিবেশ জিম্বাবোয়ের নতুন সরকারের কোন পথে হাঁটা উচিত, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে শুরু করে তারা। ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী বরিস জনসন ট্যুইটারে মন্তব্য করেন, মুগাবের পদত্যাগ জিম্বাবোয়ের মানুষকে আশান্বিত করল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে-ও একই সুরে বলেন, 'মুগাবের শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নিপীড়ন। ... ইদানীং আমরা দেখেছি, জিম্বাবোয়ের মানুষ অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বৈধ সরকার গড়ে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে চাইছে' (আল-জাজিরা, ২১ নভেম্বর)। ২২ নভেম্বর প্রকাশিত বিবিসি-র একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে, মুগাবের পদত্যাগে দেশজোড়া উল্লাস উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা জাগিয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটাতে গেলে নতুন সরকারকে কিছু কঠিন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ব্রিটেনের মতো খুশি সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন প্রশাসনও। মুগাবেকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে তাদের ভূমিকার নানা খবর প্রকাশিত হয়েছে। ভয়েস অফ আমেরিকা ২১ নভেম্বর প্রকাশিত এক রিপোর্টে জিম্বাবোয়ের জানু-পি এফ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সে দেশের ভিতরকার বিরোধী গোষ্ঠীগুলির গোপন কথাবার্তার কথা স্বীকার করেছে। তারা বলেছে, জিম্বাবোয়ের উপর থেকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার শর্ত হিসাবে, বিরোধীদের সরকার গঠনের অধিকার দেওয়া, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি নানা ধরনের সংস্কারমূলক কর্মসূচি নেওয়ার ব্যাপারে জোর দিচ্ছে আমেরিকা। তাদের আঙুল যে মূলত মুগাবের জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচি ও স্বদেশীকরণ আইন বাতিল করানোর দিকে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। জানু-পিএফ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জিম্বাবোয়েতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আড়ালে কথাবার্তা চালাচ্ছেন বলেও জানিয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মুখ ছিলেন মুগাবে

মুগাবের অপসারণে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এত আনন্দিত কেন? জিম্বাবোয়ের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুগাবে একজন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও কেনই বা তারা বরাবর তাঁর বিরুদ্ধতা করে এসেছে? এর কারণ, প্রথমত জিম্বাবোয়ের যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জাতিবিদ্বেষী বর্ণবিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছে, মুগাবে ছিলেন তার নেতা। দ্বিতীয়ত, মুগাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শ্বেতাঙ্গ দখলদারদের কবল থেকে জমি উদ্ধার করে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন দেশের কৃষ্ণাঙ্গ স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের হাতে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মুগাবের এই বলিষ্ঠ ভূমিকা ব্রিটেন-আমেরিকার অসন্তুষ্টির বড় কারণ।

আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে ঐক্য-সংহতি বাড়ানোর কাজে মুগাবে ছিলেন খুবই উদ্যোগী। প্রেসিডেন্ট মুগাবের নেতৃত্বাধীন জিম্বাবোয়ে আফ্রিকার দেশগুলির ঐক্য এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার আদর্শগত ও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করেছে। তিনি ২০১৫ সালে আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রধান নির্বাচিত হন। এই পদে থেকে তিনি সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি বাড়ানোর এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হাত থেকে মুক্তির বিষয়টির অগ্রগতি ঘটাচ্ছিলেন। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট মুগাবে আফ্রিকান ইউনিয়নকে ১০ লক্ষ ডলার দিয়ে এই সংগঠনটির প্রতি সদস্য দেশগুলির দায়বদ্ধতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদীরা এসব ভাল চোখে দেখেনি।

গত দশকে তৈরি হওয়া ইউএস-আফ্রিকা কম্যান্ড বা আফ্রিকমের বিরোধিতাও মুগাবের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রোধের আরও একটি কারণ। আফ্রিকা মহাদেশের সামনে বর্তমানে 'আফ্রিকম' একটি কঠিন বিপদ। আফ্রিকা মহাদেশে সামরিক আধিপত্য কায়েম করার লক্ষ্যেই এই সংগঠন তৈরি করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এটি তৈরি হওয়ার পর থেকেই আফ্রিকার দেশে দেশে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা পেন্টাগনের নাক গলানো বেড়েই চলেছে। সোমালিয়া, নাইজার, মালি, নাইজেরিয়া সহ আফ্রিকার যেখানেই আফ্রিকম নাক গলিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী লুটের স্বার্থে সেখানেই নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থায়িত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়েছে এইসব দেশ, বেড়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কট, বাসভূমি থেকে জনগণের উচ্ছেদ সহ অন্যান্য সমস্যা। মুগাবে নেতৃত্বাধীন জানু-পিএফ সরকার জিম্বাবোয়েতে আফ্রিকমকে জায়গা করতে দেয়নি। সব মিলিয়ে মুগাবে গোটা আফ্রিকা মহাদেশে ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মুখ।

জিম্বাবোয়ের ভবিষ্যৎ স্থির করবে সে দেশের জনগণ

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মুগাবের অনুপস্থিতি ব্রিটেন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে জিম্বাবোয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোয় সুবিধা করে দেবে। ইতিমধ্যেই তারা সে দেশে 'অবাধ নির্বাচন' করার কথা বলতে শুরু করেছে, যার পিছনে আসল লক্ষ্য হল নিজেদের প্রভাবাধীন পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে জিম্বাবোয়ের প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তির উপর সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট চালানো।

স্থির হয়েছে, জিম্বাবোয়েতে নতুন সরকার গঠিত হবে পূর্বতন ভাইস প্রেসিডেন্ট মানগাগওয়ার নেতৃত্বে। সেই সরকার কোন লক্ষ্যে পরিচালিত হবে ভবিষ্যতই তা বলবে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে জাতীয় মুক্তি অর্জন, আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে গোটা মহাদেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ থেকে মুক্ত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে রবার্ট মুগাবে ও তাঁর জানু-পিএফ দল উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে মুগাবের অপসারণের পর জিম্বাবোয়ে তাঁর অনুসৃত পথেই হাঁটবে, নাকি নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকারে পরিণত হবে, সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে দেশের সাধারণ মানুষকেই।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বাঙ্গালোরে ছাত্রী খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

১৫ বছরের এক ছাত্রীকে নৃশংস নির্যাতন ও খুন করার প্রতিবাদে
১৩ ডিসেম্বর কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস-এর বিক্ষোভ

সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে মানবাধিকার দিবস পালন

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা দিবসে সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম (সিপিডিআরএস)-এর পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়।

উত্তর ২৪ পরগণার সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক এ আলিম ও অন্যান্যরা। নদিয়ায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সদানন্দ বাগল এবং জেলা সম্পাদক জয়দীপ চৌধুরী, বিক্রম দেবনাথ, তপন বসু, মুক্তি ঘোষাল, জয়দেব মুখার্জী প্রমুখ। মুর্শিদাবাদে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এবং সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এম সিরাজ।

বক্তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের প্রতিবাদ করেন। তাঁরা তথ্য দিয়ে দেখান যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২০,০০০ বন্দি বিনা বিচারে আটক রয়েছেন ১০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত। এ বিষয়ে সরকার ও বিচারব্যবস্থাকে ধিক্কার জানানো হয়।

তাঁরা মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসক শক্তি কর্তৃক প্রকাশ্য ও গুপ্ত হত্যার নিন্দা করেন। তাঁরা বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ব্যক্তির সুরক্ষার ৩০টি ধারা লিখিত থাকলেও তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। ভারতবর্ষে তা কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে বক্তারা তার বিশদ বিবরণ দেন।

আশাকর্মীদের সাথে প্রতিহিংসামূলক আচরণের প্রতিবাদ

১৮ ডিসেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত আশাকর্মীদের সমাবেশের পর বিভিন্ন জেলায় তাদের উপর যে দমন-পীড়ন ও অত্যাচার শুরু হয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন ২৩ ডিসেম্বর বলেন, অত্যন্ত কম পারিশ্রমিকে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে নিযুক্ত হাজার হাজার আশাকর্মী তাঁদের দীর্ঘদিনের অপূরিত দাবিগুলি পূরণের আর্জি নিয়ে ১৮ ডিসেম্বর এক সমাবেশে মিলিত হয়েছিলেন। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, পরের দিন থেকেই বিভিন্ন ব্লকে 'চিরুনি অভিযানের' মতো প্রতিহিংসামূলক এক অভিযান শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তর। পুলিশ, আইবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন আধিকারিক 'কারা ওই মিছিলে গিয়েছিল' এ সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন, তালিকা প্রস্তুত করছেন। এমনকী তাঁদের শো-কজ নোটিস ধরানো হচ্ছে এবং চাকরি থেকে বরখাস্তের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সারা রাজ্যে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে এ ধরনের কার্যকলাপ উদ্বেগজনক। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, আশাকর্মীদের উপর উৎপীড়ন বন্ধ করে এবং সংঘর্ষের বাতাবরণ সৃষ্টি না করে তাঁদের দীর্ঘ দিনের অপূরিত দাবিগুলি মানতে হবে। এ রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, গণতান্ত্রিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগঠক ও সমর্থকদের প্রতি তাঁদের আবেদন— আশাকর্মীদের পাশে দাঁড়ান, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার-নার্স নিয়োগের দাবিতে ময়নায় অবস্থান বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার আড়ংকিয়ারনা কৃষ্ণচন্দ্র দাস প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের দাবিতে দুই শতাধিক মানুষ ১৯ ডিসেম্বর ময়না ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিএমওএইচ দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে এবং প্রয়োজনীয় স্থায়ী ডাক্তার, নার্স ও কর্মী নিয়োগ, ১০ শয্যার বন্ধ ইনডোর চালু, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ, পরিস্রুত পানীয় জল ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানায়। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ময়না থানা কমিটির উদ্যোগে এই আন্দোলনে সম্পাদক শিক্ষক সুব্রত বাগের নেতৃত্বে ৯ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন। বিএমওএইচ দাবিগুলির যথার্থতা স্বীকার করেন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানাবেন বলেন।

ঝাড়খণ্ডে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ডিএসও-র বিরাট জয়

ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় কোলহান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এআইডিএসও উল্লেখযোগ্য জয় পেল। ঘাটশিলা কলেজে সভাপতি, জামশেদপুর ওয়ার্কার্স কলেজে সহসভাপতি এবং জামশেদপুর গ্র্যাজুয়েট কলেজ ফর ওম্যানসে উপসম্পাদক ও সহসম্পাদক পদে জয়লাভ করেছে ডিএসও। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তার ছাত্রসংগঠন এবিভিপির প্রবল সন্ত্রাস সত্ত্বেও ডিএসও-র এই জয় রাজ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে যে এবিভিপি এই নির্বাচনে জেতার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। বিজেপির স্থানীয় এমএলএ ও এমপিরা এক-একটা কলেজে নির্বাচন পরিচালনা করেছেন। জামশেদপুর ওম্যানস কলেজে হার নিশ্চিত জেনে ২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে এবিভিপির ৬ জন বাদ দিয়ে সবার মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এআইডিএসও ছাড়া এই অঞ্চলে অন্য কোনও বামপন্থী ছাত্রসংগঠন নেই। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শিক্ষক বুদ্ধিজীবীরা বামপন্থী ছাত্রসংগঠন ডিএসও-র জয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ডিএসও-ই লাল পতাকার ইজ্জত রক্ষা করেছে।

দিল্লিতে নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কর্মকার একতা কেন্দ্র এবং ভবন নির্মাণ ইউনিয়ন ২০ ডিসেম্বর দিল্লিতে শ্রমিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক এম চৌরাশিয়া, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আর কে শর্মা, রাজ্য সভাপতি কমরেড হরিশ ত্যাগী সহ অন্যান্যরা বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা শ্রমিকদের নানা দাবিতে আন্দোলনের সাথে সাথে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে কাকোরি মামলার শহিদদের ৯০তম বলিদান দিবস পালন করার আহ্বান জানান। ভবন নির্মাণ মজদুর ইউনিয়নের পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল শ্রমদপ্তরের আধিকারিকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। ৮ দফা দাবিপত্রে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন, নিয়োগপত্র, বেতন স্লিপ, হাজিরা খাতা, ছুটি, ই এস আই, পি এফ ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন কার্যকর করার দাবি জানানো হয়।

এসইউসিআই(সি) কর্মীর মুক্তির দাবিতে রায়গঞ্জে বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুরে দলের ইসলামপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ও শিক্ষক সুজনকৃষ্ণ পাল ও শিক্ষক দয়াল সিংহের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে কয়েক শত মানুষের এক মিছিল ২০ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। কর্ণজোড়ায় এসপি এবং ডিএম অফিসে বিক্ষোভ সভা হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁরা উভয়েই সুবিচারের আশ্বাস দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org